The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIX (Issue 2), 2023 (pp.121 - 132)
Published in December, 2025

শহীদ সাবেরের ছোটগল্পে শিশুকিশোরের যাপিত জীবন

মোহাম্মদ আলী *

প্রতিপাদ্যসার: শহীদ সাবেরের মৌলিক সাহিত্য পাঠ করলে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন এগুলো জীবন ঘেঁষে জ্বলে ওঠা সাহিত্য। এমনকি তাঁর শিশুতোষ গল্পে শিশুর চোখে যে সমকালীন বাস্তব চিত্রের রূপায়ণ হয়েছে তা আমাদের সমাজের বাস্তব দৃশ্যায়ণ। শহীদ সাবেরের শিশুতোষ গল্পের পরিমাণও যথারীতি খুবই অল্প। এইসব গল্পে লেখকের বুনন কৌশল এবং শিশুতোষ গল্পের বিবৃতির ভেতর দিয়ে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি নির্ণীত হয় সমাজের নানামুখী সংকট ও সমস্যার। বর্তমান এই কিশোর গল্পগুলো শিশুকিশোরদের মানসিক বিকাশ ও মনস্তত্ত্ব গঠনে সহায়ক। বর্তমান গবেষণা প্রচেষ্টায় শহীদ সাবেরের শিশুতোষ গল্পের বিবিধ বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি শাসক কর্তৃক নির্মমভাবে শহীদ হন 'শহীদ সাবের'(১৯৩০-১৯৭১)। শহীদ সাবেরের সাহিত্যকর্ম তাঁর প্রতিভার তুলনায় খুবই স্বল্প। প্রতিভাবান এই শিল্পীর জীবন অপচয় হয়েছে রাষ্ট্র, সমাজ, ভাগ্য এবং কিছুটা পারিবারিক কারণে অথবা বলা যেতে তিনি পারে জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র কর্তৃক বঞ্চিত মুক্ত-বুদ্ধির শিল্পীসৈনিক হিসেবে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভে নিষ্পেষিত সম্ভাবনার অপমৃত্যুর নাম শহীদ সাবের। সুবিধাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে স্রোতের বিপরীতে আজন্ম লড়ে যাওয়া এক লড়াকু আগ্নেয়গিরির নাম শহীদ সাবের। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে ছোটগল্প, আত্মজীবনী, অনুবাদ, কবিতা এবং কিছু কিশোর গল্প ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক পরিচায়ক।

শহীদ সাবের বাংলা সাহিত্যের মননশীল পরিব্রাজনে এক উজ্জ্বল তারা, তবে অবেলায় খসে পড়া তারা। আমাদের বহুকালের ঘুনেধরা এই সমাজ, রাষ্ট্রনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা এই উজ্জ্বল তারাকে অবেলায় খসে পড়ে মরে যেতে বাধ্য করেছে। তিনি ছিলেন 'অনেকগুলো তারার মধ্যে একাকী উজ্জ্বল একটি তারা' (বাবলা ২৮২)।

সমাজ ও নিয়তি দুইহাত ভরে শহীদ সাবেরকে দিয়েছে অবহেলা, অযত্ন। পৃথিবীর বৈষয়িক লালসার উন্মাদ শাসক শ্রেণি কর্তৃক বরাবরই অবহেলিত হয়েছে পরহিতৈষী সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। ছাত্রজীবন থেকেই নিবেদিত দেশপ্রেমিক ও প্রগাঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সাবের। সবসময় ছিলেন গণমানুষের মুক্তি এবং মুক্তবুদ্ধির পক্ষে। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার জন্য নিবেদিত শহীদ সাবের ভাষা আন্দোলন ও জনসম্পৃক্ত বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের সমাবেশ থেকে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৫০-৫৪ পর্যন্ত বিনাবিচারে কারাভোগ করেন। কারাবন্দী জীবনে পিতা সালামতউল্লাহ জ্যেষ্ঠপুত্রকে পরিবার তথা মা, ছোট ভাই ও বোনের ভবিষ্যত দায়িত্ববোধের দোহাই দিয়ে আশু কারামুক্তির জন্য মুচলেকা দেওয়ার অনুরোধ করে চিঠি লিখেন। পিতা তাঁর পুত্রকে জাতীয় সরকারের কাছে রাজনীতি করবে না বলে জানানোর সর্বাত্মক অনুরোধের প্রতি উত্তরে বলিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, সমাজসচেতন ও ব্যক্তিত্ববান কিশোর সাবেরের চিঠির উত্তর ছিলো–

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

> আপনার চিঠি পেলাম। আমাদের পরিবার যে ধ্বংসের চিত্র আপনি এঁকেছেন, তা আমাকে তীব্র বেদনা দিয়েছে! ... কিন্তু আচ্ছা, আমি তো শুধু আপনাদের ছেলেই নই, সমাজের ছেলেও। সমাজের প্রতি রয়েছে আমার আরো বড় কর্তব্য (বাবলা ৪৪-৪৫)।

এই কারাগারে শহীদ সাবেরের জীবনে পরিচয় হয় সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪), রণেশ দাশ গুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭), সুকুমার চক্রবর্তী সহ প্রমুখ বিখ্যাত বিপ্লবীদের সাথে। প্রাসঙ্গিক উল্লেখ্য যে মুনীর চৌধুরী তার জীবনে যেমন কারভোগে রণেশ দাশগুপ্তের উৎসাহে রচনা করেন বিখ্যাত নাটক 'কবর' (১৯৫৩) একইভাবে রণেশ দাশগুপ্তসহ বাকী বিপ্লবী কারাবন্দীদের উৎসাহে অল্পবয়সী শহীদ সাবেরও রচনা করেন বিখ্যাত রোজনামচা 'আরেক দুনিয়া থেকে'(১৯৫৭)। পাকিস্তানের ঘাতক বাহিনী কর্তৃক বংশালের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা অফিসে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে শহীদ হন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শহীদ সাবেরকে যাপন করতে হয়েছে এক ট্র্যাজিক জীবন। যে জীবনে নেই কোনো সুস্থির ঠিকানা, নিশ্চিন্ত পথচলা। পদে পদে সে জীবনে এসেছে বঞ্চনা, অবহেলা ও ব্যর্থতা। সমাজ, সংসার ও রাষ্ট্র তাঁকে যেমন বাতলে দিতে পারেনি কোনো আলোকিত পথের ঠিকানা, তেমনি নিজেও পারেননি খুঁজে নিতে নিজের জীবনের স্থির ঠিকানা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবহেলায় কখনো কক্সবাজারের ঈদগাঁহ, কখনো কলকাতা, কখনো ঢাকার বংশাল, গুলিস্তান অথবা ঢাকা শহরের অলিগলি ঘুরেছেন শেষ জীবনের উন্মাদ প্রায় বিবস্ত্র শহীদ সাবের। তবে সর্বাবস্থায় তিনি সাহিত্য চর্চা চালিয়ে গেছেন। এমনকি শেষ জীবনে উন্মাদ অবস্থায় দেখা যায় কাগজ কলম পেলেই তিনি কবিতা লিখছেন। মানসিক বিপর্যয়ের সময় একটি লেখা ১৯৭৩ এর 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত তা খেয়াল করলেই বোঝা যায়। মানসিক অসুস্থ সাবেরের ভেতর সবসময় লেখক সাবের বেঁচে উঠতে চায়–

> হয়তো স্বপ্নলোকচারী মানুষের মতো এখন আমি কিছু করতে পারছি না, কিংবা ইতিহাসের মহৎ মেলায় আর আমি সংহত নই। ক্ষোভ কিংবা সার্থকতা দুটোই আমাকে সমান আনন্দ দিচ্ছে এ সব কথা আমি আর গীতধ্বনিময় ঔজ্জ্বল্যের জন্য লই নাতো (বাবলা ৩০১)।

১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে পত্রিকা অফিসের সাথে পুড়ে অঙ্গার হয়ে বাংলার লাল সবুজ মাটির সাথে মিশে গেলেন এই প্রতিভা। মৃত্যুর আগে সুস্থ জীবনের কর্মস্থল বংশালের 'সংবাদ' অফিসই হয়ে উঠেছিল সাবেরের শেষ আশ্রয়স্থল। দিনমান উদভ্রান্তের মতো তিনি ঘুরতেন। রাতে ঘুমাতে যেতেন 'সংবাদ' অফিসে। মেঝে, বারান্দা, হাতলবিহীন চেয়ার ছিল তাঁর ঘুমের স্থান। শহীদ সাবেরের করুণ এই মৃত্যুর বিবৃতি আমরা পাই দেশপ্রেমিক মহান লেখক ও চিন্তক আহমদ ছফার 'ঢাকায় যা দেখেছি যা শুনেছি' নামক লেখায়। পঁচিশ মার্চ থেকে শুরু হওয়া ভয়ংকর তাণ্ডব এবং ঢাকা শহরের মর্মান্তিক গা শিউরে ওঠা পরিস্থিতির হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা আছে এই প্রবন্ধে–

> শুনলাম, বংশাল রোডের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার অফিসটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। দেখতে গেলাম। কামানের ঘায়ে সমস্ত অট্টালিকাই উড়িয়ে দিয়েছে। কিছুই অবশিষ্ট নেই। কে একজন বলল, শহীদ সাবের লাশ। হ্যাঁ, তাই তো, একটা বিকৃত মৃতদেহ তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ইনিই কি এককালের প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক বর্তমানের বিকৃতমস্তিষ্ক শহীদ সাবের? নাকের উপর বসানো চশমাজোড়া এখনও তেমনি আছে। শনাক্ত করতে অসুবিধে হল না। মাথা খারাপ হওয়ার পর থেকে শহীদ সাবের এখানেই পড়ে থাকতেন রাতের বেলায়। দুই বেলা প্রেসক্লাবে গিয়ে খেয়ে আসতেন। বন্ধুরা বিকৃতমস্তিষ্ক সাবেরের জন্য এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। পঁচিশ তারিখের রাতে প্রেসক্লাব ভেঙে দিয়েছে। তার পরের একদিন নিশ্চয়ই তাঁকে উপোস করতে হয়েছে। তারপর তো বর্বর সৈন্যদের হাতে প্রাণই দিতে হল (আনোয়ার ৯১)।

নিজের জীবনের আয়ুর মতো শহীদ সাবেরের গ্রন্থ খুব বেশি নয় অথবা খামখেয়ালি শহীদ সাবের তাঁর সব রচনাকে আলোর মুখ দেখাতে সক্ষম হননি। নিয়তির পীড়ন অথবা নিজেই নির্মম জীবন পথ বেছে নেওয়া তার প্রধান কারণ। আবার ঘুনে ধরা তৎকালীন নষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাও অন্যতম কারণ হতে পারে–

> শহীদ সাবের ছিলেন একজন অসমাপ্ত সাহিত্যশিল্পী। তাঁর রচনার সংখ্যা খুব বেশি নয়। রোজনামচা, গল্প, কবিতা এবং অনুবাদ মিলিয়ে সহজেই গুণে ফেলা যায়। তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র তিনটি রচনা প্রকাশিত হয় (আলী ৩৫)।

এই অসমাপ্ত সাহিত্যশিল্পী শহীদ সাবেরের দিনলিপি জাতীয় রচনা 'আরেক দুনিয়া থেকে' (১৯৫৭), ছোটগল্পের বই 'এক টুকরো মেঘ' (১৯৫৫) ও কিশোরদের উপযোগী গল্প 'ক্ষুদে গোয়েন্দাদের অভিযান' (১৯৫৮), অনুবাদগ্রন্থ পুশকিনের 'ইস্কাপনে বিবি, গোগলের পাগলের ডায়েরী, ক্যাথারিন ওয়েন্স পিয়ারের 'কালো মেয়ের স্বপ্ন' এই তিনটি মিলে বের হয় 'কালো মেয়ের স্বপ্ন' (১৯৫৮)– এই হলো মোটামুটি রচনা। এছাড়াও অসংখ্য কবিতাও তিনি লিখেছেন। তবে তা জীবদ্দশায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। মূলত শহীদ সাবের ছিলেন বোহেমিয়ান এবং অনিশ্চিত জীবন গন্তব্যে। আবার দীর্ঘ সময় তিনি অসুস্থ বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়ে ঠিকানাবিহীন পাগল জীবন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন দৈনিক ও পত্রপত্রিকায় প্রচুর কবিতা ছাপা হয়েছিল শহীদ সাবেরের। সেলিনা হোসেনের সম্পাদনায় ১৯৮১ সালে 'শহীদ সাবেরের রচনাবলি' প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমি থেকে। শহীদ সাবের বৃটিশ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্নে শহীদ হন। এই নির্দিষ্ট কালখণ্ডে বসবাসরত শিল্পী হিসেবে সাবেরের সাহিত্য সমকাল ও সমাজ ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। সমকালকে বুকে নিয়েই এগিয়েছে তাঁর সাহিত্য রচনা। যাপিত জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা অথবা চোখের সামনের জাজ্বল্যমান রাষ্ট্র ও নিজের সমাজকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখেন। শিশুতোষ গল্পেও আমরা দেখবো স্বতন্ত্র অন্যদৃষ্টি, যা যেকোনো মৌলিক শিল্পীর থাকে। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক উক্তি তুলে ধরা যেতে পারে–

> সাহিত্য তো জীবনকে কেন্দ্র করেই রচিত। 'Literature is the criticism of Life '- ভাষ্য মধ্যেদিয়ে বুঝানো হয় যে, সাহিত্য হলো জীবন সম্পর্কে সমালোচনা। আমার মনে, জীবনকে সমালোচনা করা নয়; বরং জীবন যেভাবে যাপিত হয়ে থাকে, তার চিত্রায়ণই হলো সাহিত্য (দাশ ৭)।

শহীদ সাবেরের কিশোর গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। 'দুষ্ট ছেলে', 'বাবা', 'সমান ভাগ', 'ছেলে ধরা', 'বুদ্ধি যদি থাকে', 'বন্ধু', 'ছবি দেখতে গিয়ে', 'ওরা আছে', 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান'– এই নয়টি গল্প শিশুকিশোরের মানসিক পরিপক্বতার সহায়ক, যা গল্পের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজচিত্র নির্ণয় করে। কিশোর গল্পে আমরা দেখি যাপিত জীবন থেকেই কিশোর চোখে তার চিত্রায়ণ। তাঁর কিশোর গল্প বেশ বৈচিত্র্য ও উপাত্তে পরিপূর্ণ। সমাজের নানামুখী কৃত্রিম সংকট তাঁর ছোট শরীরের ছোটগল্পে জমে উঠে। প্রতিটি গল্পে উঠে আসে মানব জীবন ও সমাজের নানা দিক। কিশোর চোখে দেখলেও সেই দেখায় পরিণত জীবনবোধের চাপে তিনি দেখছেন এই সমাজকে :

> গল্পগুলোয় আছে নির্মল কৌতুক রসের সঙ্গে সঙ্গে একটুখানি নীতি কথার স্পর্শ বাস্তবের রূঢ় ছবি-নিত্যদিনের না পাওয়ার বেদনা। তবে গল্পের মূল উপাদানকে ব্যহত করে নীতি কথা তার প্রাণরসকে হরণ করেনি। দু' একটি গল্প ছাড়া সব গল্পে কচিমনের একই সারিতে দাঁড়িয়ে নিজের বয়েসী হিসেবে ভুলে কৈশোরের অনাবিল মাদকতায় মেতে গেছে। আবার কোথাও উচ্ছ্বসিত হতে গিয়েও পারেননি। দারিদ্র্যের গুরুভার মনকে বেদনার্থ করেছে (হোসেন ৬০)।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– গল্পগুলো শিশুকিশোরদের জীবন গঠনে উপযোগী ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি সমকালীন নানা বিষয় সেসব গল্পে তুলে আনে। 'ছবি দেখতে গিয়ে' গল্পে আমরা দেখবো পীরালী ভণ্ডামির বাজারি কৌশল। এদেশের ধর্ম ভীরু মানুষের আবেগকে পুঁজি করে প্রতারক চক্র অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নিচ্ছে মানুষের অর্থ। যা পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ছিলো এখনো তেমনই আছে। আমাদের সমাজে তাবিজ বিক্রির বাজার এখনো বেশ রমরমা। এই গল্পে হাটে ধর্মীয় ভয় ভীতি দেখিয়ে তাবিজ বিক্রির যে কৌশল আমরা দেখি তা আমাদের বেশ পরিচিত। উপমহাদেশে মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে আমাদের শহর, উপশহর, হাটবাজারে ধুরন্ধর মিথ্যাশ্রয়ী ধর্মব্যবসায়ীরা জটলা পাকিয়ে নানা ফন্দি–ফিকিরে মানুষের পকেটের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার এই কৌশল বেশ অভিনব এবং পুরোনো। আমাদের প্রায় চেনা সুরেই আমরা দেখবো তাবিজ-কবচের চাতুরী–

> এই যে দেখছেন তাবিজ, এ হল বুন্দেল শাহ পীরের স্বপ্ন দেখা ওষুধ। বাবা জীবন্ত পীর, এ তাবিজ যে নিয়ত করে গলায় দিবেন, সে নিয়ত পুরা হবেই। ---তাবিজ বেচার নিয়ম নেই বটে। কিন্তু আসছে বোশেখ মাসে বাবার সিন্নি, তার জন্য যে যা পারেন দিয়ে একটা করে তাবিজ নিয়ে যাবেন। ---বাবাকে ফাঁকি দিতে গেলে বাবা রেহাই দেবেন না (বাবলা ১৪৪-১৪৫)।

আমাদের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এই পীরালী ভণ্ডামি বহু পুরনো, যা আমাদের মৌলিক ও গুণগত অনেক সমাজ সচেতন সাহিত্যিকের নজরে আসে। যার নজির আমরা দেখি অনেক সচেতন লেখককের লেখনীতে। তবে আবুল মনসুর আহমেদ ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সিরিয়াস ও মনোযোগী পাঠক একমত পোষণ করবেন নিশ্চয়ই। আবুল মনসুর আহমেদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে বাংলাদেশের গ্রামজীবনে প্রবলভাবে জেঁকে বসা পীরব্যবসার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক ভণ্ডপীর, পীরের কতিপয় শাগরেদ, তাদের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার, পীরের রিরংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার শর্টকৌশল এবং এক প্রতিবাদী যুবকের আখ্যান শিল্পিত হয়েছে এ গল্পে। ধর্ম ব্যবসায়ীরা আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হিসেবে নিজেকে জাহির করে সাধারণ মানুষের ওপর প্রভুত্ব করছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র ৭৫ বছর আগের 'লালসালু' (১৯৪৮) উপন্যাস আমাদের সামনে সত্য উপস্থাপন করলে তাতে কি কোনো লাভ হয়েছে? কুসংস্কার রয়েছে কুসংস্কারের জায়গায়। এই সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলেনি আমাদের। এই রোগ আরও চেপে ধরেছে আমাদের অস্থিমজ্জায়। মানুষের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে ফুলেফেঁপে ওঠা লোকদের দেখি চারপাশে দেখা যায়। সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে, সমাজের শিক্ষিত মানুষরাও এই পীর ব্যবসায়ীদের মুরিদ হন, তাদের পীর ব্যবসায় সহায়তা করেন। পুরো দেশেই বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাজারের নামে ঝুলিয়ে রাখা দানবাক্স এভাবে আপনার নজরে আসে।

'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' (১৯৫৮) গ্রন্থটি ৯টি শিশু-কিশোর কাহিনি নিয়ে রচিত কিশোর গল্প সংকলন। এই নয়টি গল্পই শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক। সুকোমল শিশু-কিশোরদেরকে আদর্শিক, বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে বিকশিত করতে এবং প্রত্যুৎমান সুস্থ মানসিকতার জীবন গঠনের প্রাসঙ্গিকতায় গল্পগুলো রচনা করেন শহীদ সাবের। প্রতিটি গল্পের গঠনে এবং বুননে শিশুকিশোরদের জন্য রয়েছে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বার্তা। এই গল্প পাঠে শিশুকিশোররা অর্জন করবে নৈতিক শিক্ষা এবং আরও পরিচিত হবে বুদ্ধিমান নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উপকরণ ও উপায়ের সাথে। বেশ হাস্যরসাত্মকভাবেই উপস্থাপিত এই শিশু কিশোরদের উপযোগী গল্পের শরীর জুড়ে বিরাজমান আছে আমাদের সমাজের নানা অসঙ্গতি ও কুসংস্কারের নিদর্শন। তবে এই সহজ সরল হাস্যরস পরিবেশন করতে গিয়ে উদ্দেশ্য আর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি তিনি।

'দুষ্ট ছেলে' গল্প পাঠে আমার খুঁজে পাবো আমাদের বিগত জীবনের পরিচিত দুষ্ট ছেলেকে। যা পরিণত পাঠককে ফিরিয়ে নিবে দুরন্ত শৈশবে। আবার সমকালীন স্কুলের দুষ্টু বালকের জন্য আছে একটি ভিন্ন মেসেজ। স্কুলের দুষ্টু বালক গোরা ছাদ থেকে ঢিল মেরে মিষ্টিওয়ালার সব মিষ্টি মাটিতে ফেলে নষ্ট করে দেয়। হেডমাস্টার মশায়ের কাছে অভিযোগ করলে, হেডমাস্টার মাখন বাবু দেওয়াল থেকে চকচকে বেতটা তুলে নিয়ে পাগলের মত দুইহাতে তাকে বেতালেন। পরিস্থিতি বেসামাল দেখে মিষ্টিওয়ালা চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন গোরার হাতে মুখে সব জায়গায় তার বেতের লম্বা দাগ দিয়ে রক্ত পড়ছে। এরপর গোরাকে নিয়ে সহপাঠী সবাই হাসাহাসি করে। এতো কিছুর পরও গোরার দুষ্টুমী আর থামে না। হেডমাস্টার আর শ্রেণি শিক্ষকেরা বকাবকি করলেও বাংলার শিক্ষক অশোক বাবু তাকে বকা দিতেন না। সব শিক্ষার্থীকে খুব পছন্দ করতেন।

এরকম হাজারো উপদেশেও যখন গোরার দুষ্টুমি কমে না, তখনি অশোক বাবু একদিন শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য এমনটা বললেন, দুষ্টামী জিনিসটাই ভারি মজার। কিন্তু মজা তো অনেক কিছু নিয়ে হতে পারে, অপরকে কষ্ট দিয়ে যারা মজা পায় আসলে তারা মজার কিছুই বুঝে না। যা কিছু কর এমনভাবে কর যাতে নিজেও আনন্দ পাও, অপরেও খুশী হয়। তুমি একা দুষ্টামী করে মজা করবে, আর অন্য একজন তার ফলে কষ্ট পাবে, সত্যিকার দুষ্টামীর নামই এ নয়। গোরা সব মনোযোগ দিয়ে শুনেও চুপ করে রইলো আর এ দিকে বন্ধুরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললো 'কিরে গোরা, কেমন লাগল'। এতোকিছুর পরেও তার দুষ্টুমী থামে না। একদিন শ্রেণিকক্ষে বসে পাঞ্জা মারার সময় হেডমাস্টার ওই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে ফেলে এবং গোরাকে দেখিয়ে বাংলার শিক্ষক অশোক বাবুকে অপমান করে। অপমানসহ্য করে আর না পড়িয়ে অশোক বাবু গোরার কাছে গিয়ে জানায় তার চেয়ে আমার পিঠে একটা জুতো বসিয়ে দিতে পারলি নে তুই'-এই বলে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলেন। পরের দিন ক্লাস করার সময় অশোক বাবু দেখে গোরা কাঁদছে। তার কান্না দেখে অশোক বাবু পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখনি গোরা চিৎকার করে কেঁদে উঠে দুষ্টুমী করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। শহীদ সাবেরের ভাষায়-

> আমি আর দুষ্টামী করবো না স্যার, আমি ভালো হবো স্যার, আমি ভালো হবো।' অশোক বাবু তাকে দু' হাতে বুকে চেপে বললেন, 'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা তুমি যেন সত্যিকারের দুষ্টু ছেলে হতে পার (বাবলা ১২১)।

শহীদ সাবেরের লেখায় জীবনের বস্তুনিষ্ঠ সত্য, রূঢ় জীবন-বাস্তবতা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনুদ্ঘাটিত সত্য, উপেক্ষিতের ও শোষিত-বঞ্চিতের মর্মবেদনা অনায়াসে উঠে এসেছে। তাঁর লালিত জীবনাদর্শ তাতে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টির ছায়াপাত। এমনকি বামপন্থি রাজনৈতিক মতবাদও অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে সাবেরের সাহিত্যকর্মে। তাঁর গদ্য-ভাষাও খুবই নির্মেদ, নির্ভার। সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭২ সালে (মরণোত্তর) বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন তিনি। শহীদ সাবেরের কর্মময় জীবন খুব বেশি নয়-মাত্র চার থেকে পাঁচ বছর। ১৯৫৪-১৯৫৫ থেকে ১৯৫৮-১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি তাঁর সংস্কৃতি চর্চা পুরোদমে চলতো। তিনি একজন নাট্যকর্মীও ছিলেন। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র থাকাকালে মুকুল ফৌজের বিভিন্ন নাটকে তিনি অভিনয় করতেন এবং নাটকের সমালোচনা লিখতেন 'সীমান্ত', 'মুকুল', 'অগ্যতা' ও 'উদয়ন' পত্রিকায়। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত মুকুল ফৌজের জাতীয় সম্মেলনেও কুলী চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছিলেন। নাট্যকর্মী হিসেবে চট্টগ্রামে তিনি মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) 'কবর' নাটকটি জেলের বাইরে মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেন।

> ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে জেএম সেন হলে মঞ্চায়িত এ নাটক তখনো গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়নি। মুনীর চৌধুরীর হাতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন শহীদ সাবের (খালেদ ১৪৬)।

রণেশ দাশগুপ্তের 'শহীদ সাবেরঃ একটি অসমাপ্ত শিল্পীজীবনের কথা' শীর্ষক স্মৃতিকথার মাধ্যমে আমরা জানা যায় সাবের সবসময় কোনো না কোনো কাজের সাথে জড়িত থাকতে ভালোবাসতেন। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের দিকে অন্য ধরনের কিছু লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। এতদ্বিষয়ে রণেশ দাশগুপ্তের বক্তব্য স্মরণযোগ্য-

> নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ প্রবণতা অনেক সময় শিল্পীকে একটি বিষয়ে স্থির থাকতে দেয় না। এটাই কী কারণ? অন্য ধরনের লেখারও পরিকল্পনা ছিলো তাঁর? একটার একটা জানতে পেরেছিলাম একবার। নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন তিনি নিজেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। কোনো সমিতিও বোধহয় গঠন করেছিলেন। কিছু প্রচার পুস্তিকাও ছাপিয়েছিলেন। একটি সাহিত্য সভায় তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো এ ব্যাপারে। যারা সে সময়ে এই নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তারা হয়তো বলতে পারেন, শহীদ সাবের কোনদিন নাটক লিখেছিলেন কিনা, অথবা লিখতে চেয়েছিলেন কিনা? (দাশগুপ্ত ১৩৭)।

'বুদ্ধি যদি থাকে' গল্পটিতে পাঠক খুঁজে পাবেন আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি যৌথ পরিবারের বিগত সুখস্মৃতি। যা আমাদের চিরায়ত বাঙালি জীবনেরই অংশ। আমাদের পারিবারিক গল্পে যা প্রায় প্রত্যেক বাঙালির সুন্দর স্মৃতি। ঝুনু ঘড়ি ভাঙার ভয়ে সারাদিন বেপরোয়া ঘুরে বেড়ায়, কখনো মিষ্টির দোকানে, কখনো সিনেমা হলে, কখনো শিস বাজিয়ে রাস্তায় চলতে গিয়ে দাঁড়ায় চটকদার ম্যাজিশিয়নের জটলায়। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়নো কিশোরের মনের অপরাধের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এ গল্পে। ঝুনু নামের এই ছেলেটি নিজের ঘড়ি নিজে ভেঙে অবশেষে বোনের ছেলের ওপর দোষ চাপিয়ে রক্ষা পায়। গল্পের শেষে আমরা দেখবো কিশোর মনের পবিত্র উপলব্ধি, বোনের ছেলেকে মিথ্যে অপরাধী বানালেও আবার তাকে রক্ষা করতেও এগিয়ে আসে–

> থাক থাক আর মেরে কি হবে? ওকে মারলে তো আর ঘড়িটা ভাল হয়ে যাবে না। যা দুষ্টু হয়েছে, এক মিনিট অন্যদিকে মন দেবার জো নেই। একটু বইগুলো রাখতে গেছি, অমনি দিয়েছে ঘড়িটা ফেলে।' খোকাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। দোকানে গিয়ে ওকে কিছু চকোলেট কিনে দিল ঝুনু, ওটা মার খাওয়ানোর খেসারৎ (বাবলা ১৩৭)।

'বন্ধু' গল্পটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে কিশোর পাঠকের চিন্তার নৈতিক ভীত মজবুত হবে। গল্পে দেখা মিলবে কৈশোর সঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আমাদের কিশোরদের ব্যক্তিত্ব গঠনে অপরিহার্য। স্কুলের নবাগত ছাত্র রফিক ও বিদ্যালয়ের ভালো ছেলে আজাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় নবাগত ছাত্র রফিকের সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস নিয়ে। রফিকের সিগারেট খাওয়াটা আজাদ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। ঐদিন বাসায় ফিরেও তার মন খারাপ থাকে। অবশেষে রফিক ভালো ফুটবল খেলে বিদ্যালয়ের সবার মন জয় করে নেয়। এটা দেখে আজাদ যেচে রফিকের সাথে আলাপ করে এবং আজাদের ঘৃণার কারণে তার সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার মনস্থির করে। রফিক সিগারেট ছেড়ে দেয়ার পর থেকে রফিক আর আজাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রফিক ও আজাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কিশোর মানসিকতার বাস্তব অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন শহীদ সাবের যা আমাদের সমাজের বাস্তব রূপ। শহীদ সাবেরের ভাষায় রফিকের সিগারেট খাওয়ার কারণ এভাবেই বিধৃত হয় গল্পের শেষাংশেঃ

> আমাদের গাঁয়ের স্কুলে সবাই খায়, তাই আমিও খেতাম। কিন্তু গতকাল আমাকে সিগারেট খেতে দেখে তুমি যখন ঘেন্না করে চলে গেলে তখন ভীষণ অনুশোচনা হলো আমার। ঠিক করেছি আর

> কখনো সিগারেট ছোব না।' আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে আজাদ। বললে 'আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু সত্যিকার বন্ধু'। রফিক বলল, তুমিও। দুজনে চলতে লাগল। সারাটা আকাশ জুড়ে অগুণতি তারা ঝিকমিকিয়ে হাসছে (বাবলা ১৪৩)।

পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য গল্পকারের চেয়ে শহীদ সাবেরের গল্পের সংখ্যা একেবারেই কম। সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার সময়কাল খুবই কম। তাঁর জেল জীবন বাদ দিলে সাহিত্য চর্চার আয়ু বড় জোর সাড়ে ৪ বছর। স্বল্পায়ুর এই অস্থির মুহূর্তে তাঁর সাহিত্যকর্মের উজ্জ্বল নিদর্শনের মধ্যে কিশোর গল্পসমূহ অন্যতম। জীবনের প্রতি স্তরে স্তরেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকা শহীদ সাবেরকে শেষপর্যন্ত আগুনের লেলিহান শিখা দগ্ধ করে চিরতরে যন্ত্রণাকে প্রশমিত করে দিলেও শহীদ সাবেরের সৃষ্টিকর্মের সার্থকতা এখানে যে, তাঁর গল্পসমূহের বিশেষ করে তাঁর কিশোর গল্পসমূহের যে প্রাসঙ্গিক নৈতিক আবহ তা আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবন ও জীবনের নানামাত্রিক রূপে এসব আমাদের শৈশবের প্রেক্ষাপটে সমাজবাস্তবতার নিখুঁত চিত্র। প্রতিটি গল্পই শিশুকিশোরের মানস ও ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'ক্ষুদে গোয়েন্দার অভিযান' গল্পটিতে পাঠক পাবেন টান টান উত্তেজনা। সৈফুদ্দীন ওরফে খোকা স্কুলের থার্ড ক্লাসের ছাত্র। সারাক্ষণ ডিটেকটিভ বইয়ের গল্প মাথায় নিয়েই থাকে। ইতোমধ্যে মোট ১৮০ খানা মোহন সিরিজ, ১৮৯ খানা সেক্সটন ব্লেক, সব কটি কনান ডয়েল, নীহারা গুপ্ত, পাঁচ কড়ির সব খানা গোয়েন্দা গ্রন্থ শেষ করেছে। ডিটেকটিভ বই পড়া খোকা স্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। ছোট্ট একটা গলির ভেতর দিয়ে আসছিলো খোকা, অন্ধকার গলির মাঝামাঝি এসেই হঠাৎ একটি শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। সন্তর্পণে পা টিপে টিপে শব্দের উৎসের কাছে উঁকি মেরে দেখতে পেলো রিভলবার হাতে একদল লোক একজনের মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে কাগজ সাইন না করলে মেরে ফেলার হুমকি দিতে লাগলো। তড়িৎ খোকার মাথায় গোয়েন্দাগিরির বুদ্ধি জেগে ওঠে–

> চট করে তার মনে পড়ে গেল তার প্রিয় বইয়ের অতি-পরিচিত মানুষগুলির কথা। সত্যেন ঘোষ। ডিটেকটিভ সত্যেন ঘোষ হবার এইটেই সুযোগ। কিন্তু খোকা ভাবলো সত্যেন ঘোষ তো বয়স্ক বুড়ো লোক। সে বরং তার সাগরেদ তরুণ সুব্রত হতে পারে। ঠিক। সে হল সুব্রত। শক্তিমান, বলিষ্ঠ নির্ভীক সুব্রত। কোন চালাকী তার কাছে খাটে না। প্রত্যেকটা খুনী তার কাছে ধরা পড়ে (বাবলা ১৫৯)।

খোকা দ্রুতই বুদ্ধি খাটিয়ে ফারাক্কাবাধ থানার ওসিকে বিষয়টি অবগত করেন। ওসি দ্রুতই ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে জনা দশেক কনস্টেবলসহ একটি জীপে উপস্থিত হয়। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে খোকা দুরু দুরু কাঁপা বুকে ঘটনাস্থলে পৌছানোর সাথে সাথেই পরিস্থিতিতে ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করে। যা পাঠকের সামনে হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির উদ্রেক করে। এটি মূলত আইঢাই অভিনেতা সংঘের নতুন নাটক 'খুন আর খুনের' মহড়া ছিলো–

> বড় বড় অক্ষরে নীচের ঘটনাটি বেরুল। গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় রাজামিত্র রোডের বাড়িতে আইঢাই অভিনেতা সংঘ যখন তাঁহাদের নূতন নাটক 'খুন আর খুনের' মহড়া দিতেছিলেন তখন ফরাক্কাবাদের ও-সি'র নেতৃত্বে একদল পুলিশ তথায় গিয়ে হানা দেয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সৈফুদ্দীন ওরফে খোকা নামে এক বালক থানা পুলিশকে সংবাদ দেয় যে কিছু লোক মিলে অপর একটি লোককে হত্যা করিতে যাইতেছে। তাহারা সেই লোকটিকে কোন একটি দলিলে স্বাক্ষর করিবার আদেশসহ আধ ঘণ্টার সময় দিয়েছে, এই আধ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর না করিলে তাহাকে রিভলবার দ্বারা হত্যা করিবার হুমকী দেওয়া হইয়াছে। বালকের নিকট হইতে এই মর্মে সংবাদ পাইয়া ফরাক্কাবাদের পুলিশ তথায় হানা দেয়। আরো জানা গিয়াছে যে, থানার ওসি তথায় গিয়ে আইঢাই সংঘের প্রসিদ্ধ অভিনেতা মমতাজ উদ্দীন সাহেবকে দেখিতে পান। ঘরের মধ্যে ঢোল, তবলা, পোষাক এবং একটি নাটকের পাণ্ডুলিপিও তিনি দেখিতে পান (বাবলা ১৬২)।

কলকাতা হেয়ার স্কুলের জীবনেও শহীদ সাবের মেধার স্বাক্ষর রাখেন। জীবনে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় একটি মুক্ত বাতায়ন তিনি খুঁজে পান। কলকাতা পার্ক সার্কাসের বালু হক্কাক লেনে 'ছোটদের আসর' ও 'কিশোর সংঘ' নামে ছেলেদের দুটো সংস্থা ছিল। কিশোরদের মন-মানসিকতার সুস্থ বিকাশ ও শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের জন্য এ দুটো সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ছোটদের আসরে ছিল একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। শহীদ সাবের সেই লাইব্রেরি ও সংস্থার সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। শহীদ সাবেরের অন্যান্য লেখার মতো কিশোর গল্পের বুননেও জীবনের বস্তুনিষ্ঠ সত্য, রূঢ় জীবন-বাস্তবতা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অনুদ্ঘাটিত সত্য, উপেক্ষিতেরও শোষিত-বঞ্চিতের মর্মবেদনা অনায়াসে উঠে এসেছে। তাঁর লালিত জীবনাদর্শ কিশোর গল্পেও সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাতে লক্ষ করা যায় ঐতিহাসিক ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টির ছায়াপাত। এমনকি বামপন্থি রাজনৈতিক মতবাদও অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে সাবেরের সাহিত্যকর্মে।

তাঁর 'বাবা' গল্পে আমাদের নিম্নবিত্ত পরিবারের একটি করুণ চিত্র পাঠক হৃদয়কে ব্যথিত করবেই। শামীম নামক এক সংবেদনশীল কিশোরের কেরানি পিতা প্রতিদিন সকাল নয়টায় অফিসে যায় এবং রাত নয়টায় অথবা তারাও বহু পরে ফিরে আসে। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও এসব মানুষ দূর করতে ব্যর্থ হয় ভারতবর্ষের পুরনো অভিশাপ অভাব। দুরন্ত কৈশোরের দুরন্তপনায় সহপাঠী আতাহারের প্ররোচনায় রেশনের ত্রিশ কেজি চালের জায়গায় চার কেজি চাল কম তুলে শামীম। রেশনের টাকা দিয়ে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে এসে বাবাকে না দেখে শামীম চিন্তিত হয়ে ওঠে। আটটার আগেই ট্রাম বন্ধ হওয়ায় দীর্ঘ পথ পিতা একশ দু'ডিগ্রি জ্বর নিয়েও পায়ে হেঁটে আসে। গল্পের শেষের কয়েকটি লাইন পাঠকের সামনে আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বাস্তব ও মর্মস্পর্শী পরিস্থিতির অবতারণা করে। গল্পের শেষের কয়েকটি লাইনের ভেতর দিয়ে আমরা দেখি পুঁজিবাদী পৃথিবীতে একজন কেরানি পিতার মর্মবেদনা–

> বাবার বগল থেকে থারমোমিটারখানা নিয়ে আপা একবার দেখেই আঁতকে উঠলেন, একশ দু'ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তুমি হেঁটে এলে বাবা। 'বাবা হাসলেন। বাবার এ হাসির অর্থ শামিম বুঝতে পারেনি। সত্যিই, এ বাবার অভ্যাস। দুটো টাকা দিয়ে একটা রিকশা নিলে কিই বা এমন ক্ষতি হতো। আপার মাথায় হাত দিয়ে বাবা বলতে লাগলেন 'খেয়ে যেতেও পারিনি, বড্ড ক্ষিদে লেগেছিলো, টিফিনের সময় কিছু খাব মনে করলাম আর হলো না। হোটেলে ঢুকলে একটা টাকা খরচ নির্ঘাৎ। এক টাকা বাঁচাতে পারলে শামিমের সার্ট সেলাইয়ের মজুরী দেওয়া যাবে, সামনে ঈদ আসছে। বাবা চুপ কোরলেন। শামিমের মনে হলো গোটা লাইট-হাউস ছবি ঘরটা যেন মাথায় ভেঙ্গে পড়লো (বাবলা ১২৫)।

শহীদ সাবেরের কিশোর গল্পের পরিমাণ যেমন খুবই অল্প আবার গল্পগুলো আকারেও অধিকাংশ ছোট। এই ছোট ছোট গল্পের ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয় নির্ণয় করেছেন। যা কিশোর পাঠকের জন্য যেমন শিক্ষণীয়, তেমনি পরিণত বয়স্কদের জন্য শৈশবের নির্মল আনন্দ ফোয়ারা। এই গল্পের আবেদন বাংলা সাহিত্যে বরাবরই গুরুত্ব বহন করবে বলে মনে করা যায়। এক-একটি গল্পের ধরন ও বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন আমেজ তৈরি করে। যেমন 'সমানভাগ' গল্পটির কাহিনি আমাদের অতিপরিচিত এবং নিজের পরিবারেরই গল্প বৈকি।

'সমানভাগ' গল্পে মন্টু-পিন্টু দু'ভাইয়ের প্রত্যাহিক নানা জিনিস ও খাবার নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। দুই ভাইয়ের বিভিন্ন জিনিসের ভাগ নিয়ে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পটিতে পাঠক নির্মল আনন্দ যেমন খুঁজে পাবে, তেমনি কিশোর পাঠকের চৈতন্যে গল্পটি ধাক্কা দিবে। চাকা গাড়িতে চড়ার ভাগ নিয়ে মন্টু একদিন পিন্টুকে বুদ্ধিতে হারিয়ে

দেয়। পরদিন থেকে পিন্টু আরো মন্টুর চেয়ে বেশি খাবার বায়না করে না। ছোট ভাই বড় ভাইয়ের কাছে পরাজিত হয়ে নিজের ভুল শোধরাতে সিদ্ধান্ত নেয়। শিশু মনের কাছে এ-গল্পের আবেদন যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

'ছেলে ধরা' গল্পে ঢাকার ছেলে রশীদ কলকাতায় গিয়ে সেখানকার ক্ষুদে প্রতারক ভোম্বলের পাল্লায় পড়ে। মায়ের প্রশ্রয়ে ভোম্বল এক একদিন কলকাতার এক এক জায়গায় রাস্তার ধারে বসে কাঁদতে থাকে এবং হারিয়ে গেছে ভান করে পথিকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কোনো লোক যখন দয়া করে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে তখন সে এখানে নয় সেখানে বলে লোকটিকে নানা স্থানে ঘোরায় এবং কোনো না কোনো জিনিস কিনে দিতে বলে বা নগদ টাকা চায়। এমনিভাবে সে একদিন রশীদের কাছ থেকেও পাঁচ টাকার জিনিস কিনে নেয়। শেষে ওকে রশীদ যখন ওর বাড়িতে পৌঁছে দিলো তখন ভৌম্বলের মা তাকে বলেছিলেন–

> তোমার কপাল ভালো, চার পাঁচ টাকার ওপর দিয়ে গেছে। পরশুতো খেয়ে দেয়ে পনেরো টাকা ঘরেই এনেছে। আয় ভোম্বল, ঘরে আয়। ছেলেটা তেমনি পিট্ পিট্ করে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল। মা দড়াম করে দুয়ারটা বন্ধ করে দিল (বাবলা ১৩৩)।

এমনি কৌতুকরস সৃষ্টি করেও শহীদ সাবের নিষ্ঠুর সমাজ-বাস্তবতাকেই তুলে ধরছেন এই গল্পে। 'ছেলে ধরা' গল্পে শহীদ সাবের আমাদের সামনে বাঙালি সমাজের বহু পুরনো একটি সমস্যা নির্ণয় করে দিয়েছেন। আমরা জাতি হিসেবে বেশ গুজবের চর্চায় অভ্যস্ত। আমাদের সমাজের রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আমরা বেশ গুজব চর্চায় পারদর্শী। এই গল্পের শুরুতে শহীদ সাবের আমাদের বাঙালি সমাজের পুরনো সমস্যাটির অবতারণা করেন বেশ সচেতনভাবেই। কলকাতায় ছেলে ধরার উপদ্রবের খবরে শহর যখন বেশ তোলপাড় তখন চায়ের দোকানে আড্ডায় এ সব নিয়ে চলে তুমুল বাগ বিতণ্ডা–

> এ সব কেন হচ্ছে জানেন? 'আর একজন বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বললেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরে এখন হাইড্রোজেনে বোমা নিয়ে যে পরীক্ষা চলছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে (বাবলা ১৩৩)।

গল্পের এই অংশ আমাদের সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন পদ্মাসেতুর নির্মাণকালীন অপপ্রচারের কথাই পাঠক চিত্তে ভেসে আসবে। অপপ্রচার আমাদের বাঙালি সমাজের বহু পুরনো রোগ। এরকম বিভিন্ন রোগ আমাদের মগজে গেঁথেই আছে। যেমন ভূত বিতর্কও বহুপ্রাচীন। 'ওরা আছে' গল্পে ভূতের অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে। 'ওরা আছে' গল্পটি একটি সুখপাঠ্য গল্প। এ গল্পের চরিত্র স্কুলের শিক্ষক সিরাজী ও আলম সাহেবের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক মীমাংসিত হয় বীভৎস করুণ ও হাস্যরস সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। সিরাজ ভূত আছে সেটা প্রমাণ করার জন্য সে ষড়যন্ত্র করে আলম সাহেবকে ভয় দেখান; আর আলম সাহেব সাহস ও বুদ্ধির জোরে সেই ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করে দেখান যে ভূত বলতে দুনিয়ায় কিছু নেই। মানুষই ভূত ও তার ভয়ের স্রষ্টা। এখানেই শহীদ সাবেরের কিশোর গল্পের বহুমাত্রিকতা ও রসবোধ।

প্রকৃতপক্ষে শহীদ সাবেরের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের শুরু কৈশোর থেকেই। পার্ক সার্কাসের কিশোর সংঘে'র কর্মী হিসেবেই তাঁর জীবনের সূচনা। যেখানে বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠানের মধ্যমনি তিনিই ছিলেন বলে মনে হয়। এ সংঘ থেকে 'ছন্দশিখা' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকা বের হত, আর সেটির সম্পাদনা করতেন শহীদ সাবের। সাহিত্যিক সাবেরের সৃজনশীলতা বিকাশের প্রথম সিঁড়ি হিসেবে কাজ করেছে এই 'ছন্দশিখা' পত্রিকা কিশোর বয়সেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর এমন ঝোঁক ছিলো যে, কাউকে সামনে পেলেই তিনি তাঁকে কবিতা শোনাতে চেষ্টা করতেন। স্কুলের ছাত্রজীবনেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সাহিত্যপাতায় সাবেরের প্রথম

লেখা প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ, আর সাহিত্যবিভাগ দেখতেন কবি আহসান হাবীব। 'দৈনিক ইত্তেহাদে' শহীদ সাবেরের গল্পও প্রকাশিত হয়। শহীদ সাবেরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই 'আরেক দুনিয়া থেকে' বইটিও কৈশোরে লেখা। ফলে এখানেও আমরা তাঁর কিশোরদের জন্য উপযোগিতা যাচাইয়ের ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবে নিতে পারি–

> আরেক দুনিয়া থেকে কলকাতার নতুন সাহিত্য পত্রিকার চৈত্র, ১৩৫৭ সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৫৪ সালের মার্চ পর্যন্ত শহীদ সাবের রাজবন্দী হিসাবে জেলে বিনা বিচারে আটক থাকেন। চট্টগ্রাম জেনে থাকাকালেই ১৯৫০ সালেই এটি লেখা শুরু হয় এবং রাজশাহী জেলে থাকার সময় লেখা শেষে এটি ছাপার জন্যে কলকাতায় প্রেরিত হয়। জামিল হোসেন ছদ্মনামে এটি 'নতুন বাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জেলজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত রোজনামচা বা দিনলিপি জাতীয় রচনা এটি। এতে চট্টগ্রাম জেলের এবং জেলজীবনের নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। নানা অপরাধে দণ্ডিত কয়েদী এবং রাজবন্দীদের জীবন-বাস্তবত। এতে আন্তরিক পরিচর্যায় বিধৃত। সেই সঙ্গে এতে আছে জেল- ব্যবস্থ। ও কর্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতির তীক্ষ্ণ সমালোচনা। এ-ব্যবস্থা যে মানুষকে সংশোধন করার চেয়ে বেশী অপরাধী করে তোলে, লেখক প্রসঙ্গত তা-ও উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন (আলী ৩৯)।

শহীদ সাবেরের শিশুতোষ গল্পের আবেদন বহুমাত্রিক, বলা যায় আমাদের জীবনের নানামাত্রিক সমস্যার নির্ণয় ও আশু সমাধানের পথ বাতলে দিতে সহায়ক এই গল্পগুলো। যদিও গল্পগুলো শিশু কিশোরদের জন্য রচিত, কিন্তু গল্পে আছে নানামুখী প্রাসঙ্গিক বিষয়-আশয়। মুক্তবুদ্ধির শিল্পীসৈনিক শহীদ সাবেরের আসল নাম আবুল কালাম মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাবের। তিনি সকলের কাছে শহীদ সাবের নামেই পরিচিত ছিলেন। শহীদ সাবের বহুমাত্রিক প্রতিভাধর এক সংগ্রামী শিল্পীর নাম। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, বিশিষ্ট অনুবাদক, সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। পেশাগত জীবনে ছিলেন দৈনিক সংবাদ' –এর উপসম্পাদক। শহীদ সাবের এই নামেই তিনি লেখালেখি করতেন। ভাষা আন্দোলন ও জনসম্পৃক্ত বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান সরকার শহীদ সাবেরকে কারারুদ্ধ করেন। কারাজীবনের সোনালি ফসল কারাজীবন ভিত্তিক উপন্যাস 'আরেক দুনিয়া থেকে' রচনা করে তিনি তা কলকাতায় সাহিত্য পত্রিকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় তা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ রচনা প্রকাশিত হলে বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে তা বিপুলভাবে সাড়া জাগায়। সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ রচনার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন এবং বাংলার সাহিত্য ভুবনে এ নবীন সাহিত্যিককে স্বাগত জানান।

আলোচনার পরিশেষে আমরা বলতে পারি, শহীদ সাবের একজন জাত জীবনবাদী শিল্পী। জীবন দিয়েই অথবা জীবন ক্ষয়ে রচিত সাহিত্যকর্মে তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। স্বল্পায়ুর শহীদ সাবেরের অন্যান্য সাহিত্যসম্ভারের পাশে আলাদা উজ্জ্বলতা নিয়ে জাজ্বল্যমান থাকবে তাঁর শিশুতোষ গল্পসমূহ। গল্প রচনায় তিনি যেমন পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি গল্পের বিবরণেও পরিশীলিতভাবে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও চরিত্রে এগিয়েছেন। ছোট আকারের এই নয়টি গল্পের প্রত্যেকটিতে শিশুকিশোর ও আমাদের ঘুনে ধরা সমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক ও নির্মোহ আদর্শ বার্তা আছে। তা একদিকে আমাদের কিশোরদের নৈতিক মানস গঠনের উপকরণ, আবার অন্যভাবে বলা যায় ঔপনিবেশিক যাতাকলে পিষ্ট সমাজের জন্য সংশোধনী বার্তাও বটে। লেখকের সমকালে তা যেমন উপযোগী ছিলো, তেমনি সমকালেও সেসব নিজগুণে সমাদৃত ও পাঠকপ্রিয়। তবে গল্পের শরীর আরেকটু বড় হলে গল্পের আবেদন বৃদ্ধি পেতো। হয়তো গল্পের এই আকারকেই তিনি প্রাসঙ্গিক মনে করেছেন, অথবা এটাই

লেখক হিসেবে তাঁর সক্ষমতা ছিলো। আবার আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে তিনি জীবনের দীর্ঘ সময় মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। সংখ্যার বিচার্যে হয়তো তার অনেক গল্প পাঠকের কাছেই পৌঁছেনি। অথবা ক্রমশ মস্তিষ্ক বিকৃত হতে থাকা সাবেরের অব্যবস্থাপনায় অন্যান্য রচনার মতো কিছু গল্পও আলোর মুখ দেখার সুযোগ পায়নি। সবশেষ আমরা বলতে পারি, কিছু অক্ষমতার পরেও উক্ত শিশুকিশোর গল্পসমূহ পাঠকমহলের কাছে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

আনোয়ার, নুরুল (সম্পা.)। *আহমদ ছফা রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৮।

আলী, মুহাম্মদ ইদরিস। *'শহীদ সাবের*, অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন' ১৯৮৯, ১৯৮৯।

আজিজ, মহীবুল। *হাসান আজিজুল হক : রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার*,অচিরা, ১৯৯৫।

ইসলাম, আজহার। *'বাংলাদেশের ছোটগল্প: বিষয়ভাবনা ও শিল্পমূল্য'*, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬।

খালেদ, মোহাম্মদ (সম্পা.)। *হাজার বছরের চট্টগ্রাম*, কোহিনূর ইলেট্রিক প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। *'বাংলাদেশের ছোটগল্প'*, সাহিত্য পত্রিকা (৩৬ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।

দাশ, শ্রীশচন্দ্র, *সাহিত্য-সন্দর্শন*, বুকস ফেয়ার, ২০১৩।

দাশগুপ্ত, রণেশ: 'শহীদ সাবের একটি অসমাপ্ত শিল্পীজীবনের কথা', সেলিনা হোসেন (সম্পা.), *শহীদ সাবেরের রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮১।

বাবলা, মযহারুল ইসলাম (সম্পা.)। *শহীদ সাবের রচনা সমগ্র*, অনুপম প্রকাশনী, ২০১২।

বানু, সায়েদা। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে বাস্তবতার স্বরূপ*, হাক্কানী পাবলিসার্স, ঢাকা। ২০০০।

বাংলা একাডেমি। *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, ১৯৭৯।

বাংলাপিডিয়া। *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ,খণ্ড-৩*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

বিশ্বাস, মিল্টন। *বাংলা কথাসমালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০০৬।

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ। *বাংলাদেশের ছোটগল্পে শাহেদ আলীর অবদান*, বলাকা, ২০১৮।

রহমান, সাঈদ-উর। *'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য'(১৯৯২-১৯৯৭)*, বাংলা একাডেমি, ২০০৩।

সাবের, শহীদ (জীবনী পরিচিতি): [১৯৩০ সালের ১৮ ডিসেম্বর কক্সবাজারের ঈদগাঁও ছোট্ট ফুলেশ্বরী নদীর তীরে ঘেঁষা সবুজ এক গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ সাবের। পুরোনাম এ কে এম শহীদুল্লাহ। বাবা সালামতউল্লাহ ও মা শফিকা খাতুনের প্রথম সন্তান তিনি। নানা হামিদুল্লাহ চৌধুরী ছিলেন ঈদগাঁর জমিদার। শহীদ সাবের ঈদগাঁহ প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনার পর ১৯৩৭ সালে কলকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে আবার ফিরে আসেন পূর্ববাংলায় তথা বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এবার ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে। সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে মেট্রিক পাস করেন। আই.এ. ভর্তি হন চট্টগ্রাম কলেজে। এসময় তিনি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের সথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে যান। ১৯৫০ সালে

কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের সমাবেশ থেকে গ্রেফতার হন। প্রথমে তাঁকে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম জেলে, পরে রাজশাহী জেলে। রাজশাহী জেলে বসেই আই.এ. পাস করেন। চার বছর জেল খেটে বের হন ১৯৫৪ সালে, বি.এ. ভর্তি হন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের নৈশ বিভাগে এবং ১৯৫৫ সালে বি.এ. পাস করেন।]

হানুম, খালেদা। *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৯৭।

হোসেন, সেলিনা (সম্পা.)। *শহীদ সাবের রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, ১৯৮১।